দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 SEP 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

192

27

১৭ই সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষা দিবসের দাবী ছাত্র আন্দোলনের প্রত্যাশিত স্বকীয় ধারা

বীনা শিকদার

এদেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ প্রতিবছর ১৭ই সেপ্টেম্বরকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। ১৯৬২ সালের এ দিনে কুখ্যাত আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কর্তৃক গঠিত শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতি বাতিলের দাবীতে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। মোস্তাফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহর রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। আন্দোলনের মুখে আইউবশাহী 'শরীফ কমিশন' বাতিল করলেও একই শিক্ষানীতি হামুদুর রহমান শিক্ষাকমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে চাপানোর চেষ্টা করা হয়। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হামুদুর রহমান কমিশনের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু আজও ছাত্রসমাজের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ছাত্রদের প্রতিটি আন্দোলনে তাই গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী সর্বাগ্রে স্থান পায়।

ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় মানুষের শিক্ষা লাভের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের সরকারী আয়োজনের প্রতিবাদে। ছাত্রসমাজ যখন তার শিক্ষার অধিকার আদায়ের সংকল্প ব্যক্ত করে তখন তার সংঘবদ্ধ রূপ হিসেবে জেগে ওঠে ছাত্র আন্দোলন। শক্তির জোরে দমন করতে এগোয় স্বৈরাচার। আন্দোলন আরো ফুঁসে ওঠে। মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হয় সরকার ও ছাত্রসমাজ। ছাত্র আন্দোলন শিক্ষাঙ্গন থেকে পা বাড়ায়। দখল করে রাজপথ। রাজপথে ছাত্ররা মিলিত হয় শ্রমিক-কর্মচারী, পেশাজীবীসহ সংগ্রামী জনতার অন্যান্য অংশের সাথে। শিক্ষার সংগ্রাম আর জীবনের সংগ্রাম একাকার হয়ে যায়।

ভাষার সংগ্রাম যেমন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শবদেহে বীজ বুনেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের, তেমনি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ '৮৩-তে মজীদ খানের শিক্ষানীতি রুখতে গিয়ে সূচনা করেছিল সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের। যে আন্দোলনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে অবৈধ ক্ষমতাদখলকারী, এরশাদ সরকারের পতন ঘটেছে এবং দেশ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু যে ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে সেই ছাত্রসমাজের নিজস্ব দাবী ১০ দফার ভাগ্যে কি জুটেছে?

স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষার সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা হয়নি বরং ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসনকাল থেকে আজ অবধি প্রতিটি সরকার পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন মোড়কে সাজিয়ে সযত্নে টিকিয়ে রেখেছে এবং তার সাথে নতুন নতুন গণবিরোধী উপাদান সংযুক্ত করেছে। যার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ লাগাতার লড়াই করে আসছে। কিন্তু সমস্যার মৌলিক কোন সমাধান হয়নি। তাই '৬২-র্তে শিক্ষা সংকোচন নীতি রুখতে আমাদের পূর্বসূরীরা যে রক্তঝরা সংগ্রামের সোপান রচনা করেছিল সেই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আজকের ছাত্রসমাজকে লড়তে হচ্ছে। লড়তে হচ্ছে অনিবার্য কারণেই। নিরাপদ জীবনের জন্য যেমন চাই গণমুখী শিক্ষা, তেমনি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য চাই শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও জনগণের সরকার। তাই শিক্ষার সংগ্রাম আর জীবনের সংগ্রাম একাকার হয়ে গেছে বার বার।

দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরাচারী শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামো আজ ধ্বংসের প্রান্ত সীমানায় উপনীত। শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগ্যেও জুটেছে একই পরিণতি। শিক্ষার চিত্রটি আমাদের সামনে সবচেয়ে বেশী উদ্বেগজনক। দেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫% মানুষ জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম, কাজেই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিক্ষিতের এ হারও অর্থহীন, কারণ তথাকথিত এ শিক্ষিত জনগণের বিরাট একটি অংশ কেবলমাত্র নিজের নাম লিখতে সক্ষম। যদিও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সরকারী ঘোষণা রয়েছে তবুও বাস্তবতা ভিন্নতর। মোট জনসংখ্যার যে ভাগ্যবান অংশটি শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করার সুযোগ পায় তারাও বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জায়গা না পেয়ে। প্রতিবছর লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এদের মাঝে অর্ধেকেরও বেশী পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার আসন সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য অর্থের সংকুলান রাষ্ট্রীয় বাজেটে হচ্ছে না অথচ সামরিক খাতসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অনুৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দ বেড়েই চলেছে। 'গণতান্ত্রিক সরকারের' বাজেটে সামরিক খাতের তুলনায় শিক্ষা খাতে বাজেট কমেছে। বেকারদের জন্য কোন আশার আলো এ সরকারও দেখাতে পারেনি। চাকরিতে নিয়োগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। ফলে লাখ লাখ যুবক অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে।

এছাড়া রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ প্রায় শ'খানেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে চরম বৈষম্য। একদিকে কিণ্ডার গার্টেন, ক্যাডেট স্কুল-কলেজ এবং অভিজাতদের সন্তানদের জন্য অন্যান্য স্কুল-কলেজ; অন্যদিকে গ্রামের নড়বড়ে প্রাইমারী স্কুল ও অন্য অবহেলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। একটি অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি এদেশের ছাত্রসমাজের দীর্ঘ দিনের দাবী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাই শুরু হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। যদিও গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষার শ্লোগানসম্বলিত লেবেল প্রতিটি সরকারের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হয় নির্দিষ্ট অংশের জন্য। ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল-কলেজ আর ক্যান্টনমেন্ট কলেজগুলোর পেছন সরকারী ভর্তুকির পরিমাণ থেকেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের পেছনে বার্ষিক যে টাকা ব্যয় হয় সে টাকায় অন্তত একশ' জন ছাত্রের প্রাথমিক শিক্ষার খরচ চলে। অর্থাৎ ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের জন্য একশ' জনকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এদেশের জনগণের করের টাকায়, উৎপাদনের বিনিময়ে, প্রণয়ন করা হয় জাতীয় বাজেট। অথচ এই বাজেটের টাকায় প্রবর্তিত শিক্ষানীতির মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী কেবলমাত্র নিজেদেরই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করছে।

শিক্ষার এই সংকট নিরসন তাই আজ ছাত্রসমাজ তথা গোটা জাতির সামনে একটি মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে। একটি অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানভিত্তিক, সার্বজনীন, গণমুখী শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাসহ সার্বিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে '৮৩-তে প্রণয়ন করা হয়েছিল ১০ দফা কর্মসূচী। ১০ দফার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে তার অভিপ্রকাশ রয়েছে। ১০ দফা ছাত্রসমাজের দাবী। যে দাবীর মধ্যে আরও রয়েছে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের কথা; অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিতকরণের কথা। কাজেই ১০ দফার সংগ্রামকে বেগবান করার মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজ তার স্বকীয় আন্দোলনের ধারায় এগিয়ে নেবে গণমুখী শিক্ষার সংগ্রাম।